প্রথম অধ্যায়

নজরুল ও সমকালীন বাংলা সাহিত্য : আবির্ভাবের প্রেক্ষিতে।

নজরুলের আর্বিভাব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে সামনে রেখে আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়। নজরুলের জীবনে সমকালীন সাহিত্য দারুণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে কোনো সাহিত্যিক বা সাহিত্য যুগের দাবীকে স্বীকার করে এবং ঐ দাবীকে সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। কাজী নজরুল ইসলাম এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ফলে নজরুলকে বুঝতে হলে, তাঁর সাহিত্য অনুধাবন করতে হলে, অবশ্যই সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে জানা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী বিষম সংকটময় কাল। এই সময় ভারতবর্ষে বিভিন্ন আন্দোলন এবং যুদ্ধের দামামায় মানব সভ্যতায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্ত কিছুর মূলে ছিল ইংরেজ। একসময় ইংরেজরা জাতি,ধর্ম ও তার কার্যকলাপ প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে ঘাঁটি গেড়েছিল, সেই ঘাঁটিই এক সময় বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এছাড়াও ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তৈরী হওয়ার পিছনে সে দেশের শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ছিল। পরবর্তী কালে সে সম্পর্কে ক্রমশ চিড় ধরতে শুরু করে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংল্যান্ডের কল্যাণকর দিকটিই বেশি প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারতবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন বাঙালী তাদের আন্দোলন থেকে কিছুটা হলেও সরে দাঁড়ায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বড় কিছু লাভের আশায় ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করে। যদিও এই যুদ্ধের সঙ্গে ভারতের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। যুদ্ধের পরে ভারতবাসীর তো কোনো লাভই হল না উপরন্তু তাদের ভাগ্যে জুটলো অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যবৃদ্ধি এবং হতাশা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যারা জয়লাভ করলো তাদের ভাগ্যে তো কিছুই জুটলো না, আবার যে সমস্ত দেশ পরাজয় স্বীকার করলো তাদের ভাগ্যেও আশানুরূপ কিছুই মিলল না। দেশের বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকলো। অন্যদিকে রুশবিপ্লবের ঢেউ ভারতের বুকে আছড়ে পড়তে লাগল । মহাযুদ্ধের অকল্যাণকর দিকটি দেশের সর্বত্র, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে শুরু করলো। মানুষের চিন্তা-চেতনায় তার প্রভাব পড়তে শুরু করলো। জীবনের বাইরেই শুধু নয়, জীবনের অভ্যন্তরেও তার অকল্যাণকর দিকটির প্রতিফলন লক্ষ করা গেল। মানুষের মানসিক ব্যাধি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো । এই সমস্ত মানসিক ব্যাধির উৎস খুঁজতে গিয়ে ফ্রয়েড চেতনলোকের মধ্যে অবচেতনের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন। মনোবিজ্ঞানের অস্তিত্ব খুঁজতে গিয়ে ফ্রয়েডের মতো অনেক মনোবিদের আর্বিভাব ঘটল।

মহাযুদ্ধের পর দেখা গেল মানুষের প্রাণের মূল্য কমে গিয়ে মৃত্যুর আয়োজনই বড় হয়ে উঠল। এই লাঞ্ছিত মানবিকতার মধ্যে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত অসহায় ভাবে ঘুরপাক খেতে থাকলো। মানুষের মধ্যে সংশয়, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা বড় হয়ে দেখা দিল। ক্রমশ দেশবাসীর কাছে ইংরেজদের মুখোস খুলে গেল, তাদের ভাওতা দেশবাসী বুঝতে পারলো। ফলে কংগ্রেস ক্রমশ ইংরেজদের কাছ থেকে দূরে চলে গেল। যার ফলে সারা দেশে প্রতিবাদ, আন্দোলন অনশন শুরু হয়ে গেল। এই সমস্ত আন্দোলনকে ইংরেজ যখন দমাতে পারছিল না তখন ইংরেজ অভিনব উপায়ে 'রাউলাট অ্যাক্টের' মাধ্যমে (১৯১৯) সরকার শাসনের চরম রূপ প্রকাশ করলেন। বিনা বিচারে আন্দোলনকারীদের জেলে ভরতে শুরু করলেন, জেলের মধ্যে শুরু করলেন অকথ্য অত্যাচার , সংবাদপত্রের বাক্‌রোধ করা হল। ইংরেজ অকারণে মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করে। ইংরেজরা শাসনের চরম রূপ প্রকাশ করতে গিয়েই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ জনগণের উপর এলোপাথারী গুলি চালালো। এই ঘটনার নিন্দায় সারা দেশ সরব হলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদ স্বরূপ ইংরেজ প্রদত্ত 'নাইট হুড' উপাধি পরিত্যাগ করলেন । এরপর ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারাদেশ অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে আমেদাবাদের সূতাকলে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করল। এই ভাবে সারা দেশে ধর্মঘট, বয়কট ও আন্দোলনের মধ্যদিয়ে নিজেদের দাবীকে কার্যকর করার চেষ্টা করলেন। জেলবন্দী কয়েদিরা জেলের মধ্যে অনশনের পথে নামলো। এই ভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ইংরেজ বিরোধী লড়াই আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। গড়ে উঠল বিপ্লবী দল, গরে উঠল অনুশীলন সমিতি। এভাবেই লড়াই সংগ্রামের বীভৎসতা লক্ষ করা গেল। ভারতবাসীর বিদ্রোহ দেখে ইংরেজরাও এক সময় ভয় পেয়ে গেল।

কাজী নজরুল ইসলামের বাল্যজীবন এই সমস্ত আন্দোলন, বিদ্রোহ, উন্মাদনার মধ্য দিয়ে কেটেছে। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে জন্মগ্রহন করেন। সারাদেশে আন্দোলন ও বিদ্রোহের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল চুরুলিয়া গ্রামেও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়ানক অভিজ্ঞতা নজরুল যেমন অর্জন করেছেন তেমনি রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলন ও ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। রাশিয়ার অত্যাচারী শাসক জারের অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলন গড়ে তোলে। যার ফলেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নজরুল করাচীর সৈন্যদলে থাকার সময়ই এই সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের খবর রাখতেন এবং লালফৌজের অভিযানের সাফল্যে নিজে উল্লসিত হয়ে পড়তেন । নজরুল নিজেই যেহেতু একজন সর্বহারা মানুষ তাই সর্বহারা মানুষের জয়গৌরবে নিজে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তেন। বিশ শতকের গোড়াকার এই প্রেক্ষিতে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব । ফলে নজরুলের সাহিত্য জীবনকে বুঝতে হলে, বাংলাদেশের তদানীন্তন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের ব্যক্তি জীবনের প্রস্তুতির কথাও স্মরণে রাখতে হবে।

কাজী নজরুল ইসলাম যখন কলম ধরলেন তখন সাহিত্যের মধ্যাকাশে বিরাজমান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিরে আসতে চেয়েছেন। হীনবল বাঙালীকে তিনি নাড়া দিতে চেয়েছেন। যার কারণে বাঙালীদের আন্দোলনে নিজে গান বেঁধেছেন। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটলে নজরুলের কবি জীবনও চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও (১৮৭৬-১৯৩৮) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় ।শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য জীবনে প্রায় ত্রিশ খানি উপন্যাস ও অনেকগুলি গল্প লিখেছিলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস,ছোটগল্প, নাটক এবং একের পর এক প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন। সেই জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ রবীন্দ্রযুগ বলে পরিচিত। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম শতক থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাম প্রচারিত হতে থাকে। কারণ এই সময় রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রকাশিত হয়ে গেছে। তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাটবলেই চিহ্নিত ছিলেন। সেইসময় যুবক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পদচারণা শুরু হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের যথার্থ জনপ্রিয়তা প্রকাশ পেল ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মধ্য দিয়ে। এই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্র প্রভাবিত পথ ছেড়ে পন্থান্তরের সন্ধান করলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিছু রাজনৈতিক ভাবনা বাঙালী মানসকে দারুণ ভাবে নাড়া দিল। এই সময় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের চেষ্টায় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের শক্তি সঞ্চয় হতে শুরু করলো। পূর্বেই বলেছি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল ।প্রথম দিকে কংগ্রেস রাজনৈতিক আলোচনার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে তাদের সভায় যোগদান করতে শুরু করলো।

এই সময় কংগ্রেস দলে সাধারণ মানুষের যোগ খুব একটা ছিল না। ১৮৯০ সালের পর থেকে কংগ্রেসে নানা পরিবর্তন শুরু হল। বোম্বাইয়ে গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হতে শুরু করলো। ১৮৯১ সালে ইংরেজ সরকার বাংলাকে দুটি শাসনবিভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা করে, আসলে উগ্রপন্থী হিন্দু যুব সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্যই এই চালাকি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্জন সাহেব বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। সেই প্রতিবাদে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। বাংলার আহত আত্মা যেন কেঁপে উঠল। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কবি নাট্যকার, সাহিত্যিক, এমনকি অজস্র সাধারণ মানুষ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথও আন্দোলনের পুরোধা হয়ে যোগদান করলেন। এই আন্দোলন ভারতের প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল। স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী ১৯১০ সাল পর্যন্ত চললো। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গোপনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়ে গেল। কংগ্রেসও এই সময় দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল একটি চরম পন্থী

আর একটি নরম পন্থী। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তরের দল গোপনে গোপনে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করলো।

এরপর বিভিন্ন আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯২০ সালে 'অসহযোগ' আন্দোলন, ভারতের শাসন সংস্কারের জন্য ১৯২৭ সালে 'সাইমন কমিশন' গঠিত হল। এরপর ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। তারপর অনেক লড়াই আন্দোলনের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

এই সমস্ত রাজনৈতিক , সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রযুগের অর্ধশতাব্দী কেটে গেছে। এই ৫০ বছরে বাংলা সাহিত্য নানা অভিজ্ঞতা, রূপান্তর ও সংঘর্ষের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সময় বিভিন্ন কাব্য- কবিতা , কথা সাহিত্য, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রপরবর্তী আধুনিক কবিতার ধারায় নজরুল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী। যদিও সার্থক উত্তরসূরী মানতে অনেকেই রাজী হবেন না। নজরুল রবীন্দ্রনাথকে গুরু হিসাবেই শ্রদ্ধা করতেন, আবার রবীন্দ্রনাথও নজরুল কে স্নেহ করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছুদিন নজরুল আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে তাদের মধ্যে সম্পর্কের একটু হলেও চিড় ধরেছিল। বাংলা সাহিত্যে 'খুন' শব্দটিকে কেন্দ্র করে 'শনিবারের চিঠি' -র দৌলতে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝি শুরু হয়। এছাড়া তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল আগাগোড়া শ্রদ্ধার ও প্রীতির। রবীন্দ্রনাথ 'খুন' শব্দটির সমালোচনা করলে নজরুল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মশক্তি' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। সেখানে লেখা নিবন্ধটির নাম ছিল 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'।

একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের আমন্ত্রণে গিয়ে এক অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ 'খুন' শব্দটিকে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অনুমোদন করেন নি। তাঁর মতে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করলে বাংলা ভাষার দীনতাই প্রকটিত হয়। প্রেসিডেন্সিতে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তার নির্ঘন্ট 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটু নমুনা দেওয়া হল — সৃষ্ট শক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনি মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের সাথে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টি ছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো এক বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন রক্ত শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙ্গারং যদি না ধরে তাহলে বুঝব সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক্ লাগাতে চান। আমি তরুণ বল্‌ব তাঁদের যাঁদের ঊষাকে নিউমার্কেটে 'খুন' ফরমান করতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের এ কথা শোনার পর সজনীকান্ত দাস যেন উৎসাহ পেলেন। তিনিও 'শনিবারের চিঠি' তে সমালোচনা শুরু করলেন। এই ভাবে সমালোচনা করায় নজরুল স্বাভাবিক কারণেই ক্ষেপে গিয়ে থাকবেন। নজরুলও চুপ না থেকে 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় দুবার 'খুন' শব্দের ব্যবহার করলেন।

''কান্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!''
এই কবিতার পরের পংক্তিতে আবার 'খুন' শব্দের ব্যবহার করেছেন-
''ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙ্গিয়া পুনর্বার।''

সবাই যখন সমালোচনায় কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু করলো, সেই কাদায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে মাখিয়ে নেওয়ায় নজরুল অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। এরপর নজরুল আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দূরত্ব অনেক বেড়ে যায়। সবাই মিলে নানা সময় নানা ধরনের সমালোচনা করায় নজরুল আর উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সাহিত্য ও সমাজের কাছে নিজেকে অপাংক্তেয় মনে হয়েছে। অনেকদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আর যোগাযোগ ছিল না। মাঝেমধ্যে শরৎচন্দ্র নজরুলকে সমর্থন করেছেন। যাইহোক অনেকদিন পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিঙে নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ঘটে। এরপর ১৯৩৫ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নাগরিক' পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার জন্য নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরই উত্তর রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠিয়েছিলেন — অনেকদিন পরে তোমার সারা পেয়ে মন খুব খুশি হল। কিছু দাবী করেছ তোমার দাবী অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মুস্কিল এই, পঁচাত্তরে পড়তে তোমার এখনো অনেক দেরি আছে, সেইজন্য আমার শীর্ণ শক্তি ও জীর্ণ দেহের পরে তোমার দরদ নেই।
... তুমি তরুণ কবি, এই প্রাচীন কবি তোমার কাছ থেকে আর কিছু না হোক করুণা দাবী করতে পারে।
... শুনেছি বর্ধমান অঞ্চলে তোমার জন্ম। আমরা থাকি তার পাশের জিলায়— কখনও যদি ঐ সীমানা পেরিয়ে আমাদের দিকে আসতে পারো খুসি হব। স্বচক্ষে আমার অবস্থাও দেখে যাবে। এই চিঠি পাওয়ার পর নজরুলের সমস্ত দুঃখ বেদনা যেন মুহূর্তে অবসান হয়ে গেল। তাঁর আর কোনো অভিযোগই রইল না। বিনিময়ে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চায়। আর দেরি না করে 'তীর্থপথিক' নামে কবিতা লিখে কবিগুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। কবিতাটি ১৩৪২ সালে 'নাগরিক' পত্রিকায় ছাপানো হয়। এখানে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল —

হে কবি, হে ঋষি অন্তর্যামী, আমারে করিও ক্ষমা।
পর্বত-সম শত দোষ-ত্রুটিও চরণে হল জমা।
জানি জানি তা'র ক্ষমা নাই, দেব, তবু কেন মনে জাগে
তুমি মহর্ষি করিয়াছ ক্ষমা আমি চাহিবার আগে ....।
তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বের বিস্ময়,—
তব গুণ-গানে ভাষা-সুর যেন সব হয়ে যায় লয়।
তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব, এই গৌরবখানি
রাখিব কোথায় ভেবে নাহি পাই, আনন্দে মূক বাণী।

কাব্যলোকের বাণী-বিতানের আমি কেহ নাহি আর,
বিদায়ের পথে তুমি দিলে তবু কেন এ আশীস হার?
প্রার্থনা মোর, যদি আবার জন্মি ও ধরনীতে,
আসি যেন শুধু তোমার গাহন করিতে তোমার কাব্য-গীতে !!?

আসলে রবীন্দ্রনাথও নজরুলকে স্নেহ করতেন। তিনি জানেন নজরুলের উদ্দেশ্য আলাদা, বাজে কথার জন্য তিনি আসেন নি। নজরুলকে তিনি 'উদ্দাম' বলেও ডাকতেন। একবার নজরুল সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে তরোয়াল দিয়ে দাড়ি কাটতে না বলেছেন। নজরুল চলে গেলে সৌমেন্দ্রনাথকে তিনি বলেছিলেন- নজরুলের নিজস্ব একটা ধরন আছে।

এরপর নজরুল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আরও অনেক কবিতা লিখেছিলেন। একবার তিনি 'কিশোর রবি' বলে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তাতে রবীন্দ্রনাথকে 'চিরকিশোর সে প্রেমময়' বলে সম্বোধন করেছেন। এছাড়াও আরও অনেক কবিতা লিখেছিলেন। যেগুলির দ্বারা কবিগুরুকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ড. বাঁধন সেনগুপ্ত বলেছেন – ''আসলে নজরুলের জীবনে চলার পথে চলতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আশ্চার্য এক নির্ভরতার প্রতীক। সংকটে দ্বিধায় এবং বহুবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে তিনি গুরুদেবের সমর্থন ও আশীর্বাদ লাভ করে এসেছেন। তাঁর বিবাহের সময় (১৯২৪) ব্রাহ্মদের সম্মিলিত ক্রোধ ও বিরোধিতার সময়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কোনো বাঁধা তো দূরের কথা বরং শোনা যায় তিনি আশীর্বাদই লাভ করেছিলেন।'' ১

'গোরা' উপন্যাসের সঙ্গীতের সঙ্গেও নজরুল যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও নজরুলকে যে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন তার প্রমাণও দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন, নজরুলের 'বিদ্রোহী' তার ভাল লেগেছিল। আবার 'ধূমকেতুর' জন্য তিনি আশীর্বাদ পাঠিয়ে বলেছিলেন- জাগিয়ে দে রে চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন। আবার বন্দী নজরুলের উদ্দেশ্যে 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করে বলেছিলেন- জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। এছাড়া কবিগুরু নজরুলের কাব্য সম্পর্কে বলেছিলেন- জনপ্রিয়তা কাব্য বিচার, স্থায়ী নিরেখে নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে তা শুধু কাব্য নয় মহাকাব্য।

এক সময় শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গুলি দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। যার কাছে রবীন্দ্রনাথও এক সময় ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের সাধারণ নরনারীর তুচ্ছ জীবনকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন । যেখানে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মত কোনো রোমান্স কল্পনাময় প্রেম নেই। তিনি সমাজজীবনের সুখ-দুঃখের কথাকে সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে পারিবারিক কাহিনী লক্ষ করা যায়। যেমন 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা', 'পন্ডিত মশাই', 'মেজদিদি', 'পল্লীসমাজ', 'বৈকুন্ঠের উইল'

'অরক্ষণীয়া' , 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি। এই উপন্যাস গুলি মূলত পারিবারিক কাহিনীমূলক হলেও এগুলির মধ্যে মানবজীবনের কথাও আছে। এছাড়া আরো কিছু কিছু উন্যাস আছে যেগুলির বিষয়বস্তু চরিত্রনীতি, সতীত্ব, সংযম প্রভৃতি বাঁধাগতের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে মানব জীবনের অনাচার-অবিচারকে তুলে ধরে। যেমন 'বড়দিদি' , 'বিরাজবৌ' , 'শ্রীকান্ত' , 'দেবদাস' , 'চরিত্রহীন' , 'গৃহদাহ' , 'দেনাপাওনা' , 'শেষপ্রশ্ন' । এই উপন্যাস গুলি মূলত সমাজ শাসনের জন্য অর্থাৎ সমাজের ক্ষত দেখিয়ে দেবার জন্যই রচনা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র কিছু কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, সেগুলি হল — 'ষোড়শী' , 'রমা' , 'বিরাজবৌ' , 'বিজয়া', । এই সময় শরৎচন্দ্র কয়েকটি প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। যেমন- 'নারীর মূল্য' , 'তরুণের বিদ্রোহ', 'স্বদেশ ও সাহিত্য'। অবশ্য শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে নজরুলের রচনার বিশেষ কোনো সাযুজ্য নেই।

নজরুলের সমকালীন সাহিত্যকদের মধ্যে শুধু মাত্র শরৎচন্দ্রই নয়, শরৎচন্দ্রের সমকালীন বাংলা সাহিত্যকরাও এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। যাঁরা শুধুমাত্র শরৎচন্দ্রের অনুগামীই নয়, ইউরোপীয় আদর্শকে সামনে রেখে নতুন বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকরা হলেন প্রমথ চৌধুরী, মণীন্দ্রলাল বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিরা শরৎ সমসাময়িক ঔপন্যাসিক। এই সময় যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল, সে গুলি হল — প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতী গোষ্ঠী', দীনেশরঞ্জন দাশের 'কল্লোল গোষ্ঠী' প্রভৃতি।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন 'সবুজপত্রে'-র সম্পাদক, যিনি বীরবল নামে খ্যাত। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হন নি। বরং বলা যায় রবীন্দ্রনাথকেই প্রভাবিত করেছিলেন (বিশেষ করে চলিত ভাষার ক্ষেত্রে)। বিদেশে শিক্ষা লাভের পর দেশে ফিরে পুরোপুরি সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। 'সবুজপত্র' সম্পাদনার মধ্য দিয়ে যেমন অভিনব রচনা রীতির প্রচলন করেন তেমনি নানা ব্যাপারে তরুণ সমাজ কে নেতৃত্ব দিয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সংস্কারমুক্ত প্রগতিবাদের পরিচয় দেন। তিনি দু একটি রচনা সাধুভাষায় লিখলেও পরে পরিপূর্ণ ভাবে চলিত ভাষায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মতে লোকেরা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় সাহিত্য রচনা করা উচিত। এছাড়া রচনার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রগতিশীল এবং সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন মূলত যুবাধর্মের অগ্রদূত। যার ফলে গলিত সমাজকে যেমন জাগাতে চেয়েছেন তেমনি সাহিত্যের নামে ভন্ডামিকেও প্রশ্রয় দেননি। প্রমথ চৌধুরী শুধুমাত্র সম্পাদক নন , তিনি একজন প্রখ্যাত সমালোচক ও বটে।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার বিষয়বস্তুতেও প্রগতিশীলচিন্তা, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তনিষ্ঠ ভাবনা তরুণ সমাজে ব্যাপক সাড়া ফেলে ছিল। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন যৌবধর্মের প্রতীক,

গলিত সমাজের নির্মম শত্রু, আর যারা ভন্ডামী করে সাহিত্য রচনা করে বেড়ায় তাদের প্রতি কঠোর সমালোচক। প্রমথ চৌধুরী যুক্তির সাহায্যে সমাজ, সাহিত্য ও জাতীয় চরিত্রের যা কিছু কল্যানকর তাকেই তিনি সমাদরে গ্রহণ করেছেন। সেই সমস্ত মঙ্গলকর দিক গুলিকে শিষ্য ও বন্ধুদের গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী শুধুমাত্র 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদকই নন। তিনি ছিলেন প্রাবন্ধিক এবং ছোটগল্পকার। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ – 'সনেট পঞ্চাশৎ' এবং 'পদচারনা' । তিনি শুধু গদ্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন এমন নয়, পদ্য রচনায়ও তিনি অত্যন্ত সচতুর। রঙ্গব্যঙ্গের খোঁচা দিয়ে প্রবীন বাঙালীকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছেন। তিনি অনেক কবিতা ও সনেট রচনা করেছেন। সনেট গুলিতে রয়েছে তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি এবং বাক্‌রীতির চমক। সনেটের ক্ষেত্রে চৌদ্দপংক্তির অষ্টক-ষট্‌কের আঁট সাঁট বাঁধুনিকে নিঁখুত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে আবেগ ও কল্পনার প্রকাশ ঘটেনি। আসলে প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করতেন রাইম (rhyme) অর্থাৎ ছন্দ এবং রিজন (reason) অর্থাৎ যুক্তি শৃঙ্খলা। তিনি প্রায়ই কল্পনা (imaginasion) এবং আবেগকে (imotion) অবহেলা করেছেন।

তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প ও বড়গল্প রয়েছে। যেমন– 'চার ইয়ারী কথা', 'নীললোহিত', 'আহুতি', 'ফার্সটক্লাস ভূত', 'বড় বাবুর বড়দিন'। গল্পেরক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিশ্লেষনাত্মক প্রকাশভঙ্গির অভাবে ছোটগল্পের সার্থক রূপ দিতে পারেন নি। তবে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি নিখুঁত। প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন– 'তেল-নুন-লকড়ী', 'বীরবলের হালখাতা', 'নানাকথা', 'নানাচর্চা । প্রবন্ধগুলিতে তিনি ঋজু ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও শানিত ব্যঙ্গের দ্বারা সমাজের স্থবিরতাকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। সমাজও সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অসাধারণ প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের পর প্রমথ চৌধুরীই প্রথম শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তুলেছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পে সমাজের ছবিটি অপূর্ব করুণায় ফুটিয়ে তুলেছেন। একটা যুগের অবসানের সঙ্গে আর একটা যুগের আবির্ভাব হচ্ছে। পুরাতন গ্রামীন জমিদারীর শাসন চলে যাচ্ছে, আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য ছুটে আসছে শিল্পপতির দল। কলকারখানার জাঁতাকলে গ্রামের আকাশ মাটি যেমন মলিন হয়ে যাচ্ছে তেমনি নরনারীর মধ্যে চরিত্র ভ্রষ্টতা বেড়েই চলছে। এই সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনকে তিনি কথা সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। শেষে অবশ্য নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। কখনো আবার নতুন অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেছেন। যেমন বীরভূম অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তথা বেদিয়া, সাঁওতাল, আউল-বাউল, বৈষ্ণব বাজিকরদের জীবনচিত্রের ছবি আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত সব উপন্যাসগুলি হল — 'রাইকমল', 'নীলকণ্ঠ', 'ধাত্রীদেবতা', 'কলিন্দী' , 'গণদেবতা' , 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' প্রভৃতি।

তিনি অসংখ্য ছোটগল্পও রচনা করেছেন— 'জলসাঘর', 'বেদেনী', 'তারিণী মাঝি, 'অগ্রদানী' ইত্যাদি। তিনি একমাত্র লেখক যিনি সীমাবদ্ধ আঙ্গিকের মধ্যে বিচিত্র জীবনকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরে একমাত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই দক্ষতার সঙ্গে ছোটগল্পের সীমাবদ্ধ আঙ্গিকের মধ্যে বৈচিত্র্য দান করেছেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি কাহিনীর বিশাল পটভূমি ও আঞ্চলিকতা, নানাচরিত্রের নানা বৈচিত্র্য, চরিত্রে দ্বন্দ্ব, সমাজ পরিবেশ ও মূল্যমানের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের স্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র, ভূস্বামী-অভিজাত ও কৃষকদের জীবনচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি প্রত্যক্ষরীতির যে সাহায্য নিয়েছেন তা অতুলনীয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র গ্রহন করেছিলেন বাঙ্গালী পারিবারিক জীবন ও সামাজিক নীতি, আর তারাশঙ্কর অবলম্বন করেছিলেন পুরাতন ও নবীন অগস্তুকের সংঘর্ষের বিশাল পটভূমি। তবে গভীরতার দিক থেকে শরৎচন্দ্রকেই বেশি মূল্য দিতে হয়। তারাশঙ্কর অনেক জায়গায় কাহিনী বিন্যাসে শিথিলতা নিয়ে এসেছেন। শুধুমাত্র চরিত্র চিত্রনে তিনি ব্যক্তি অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছেন। যাইহোক সামগ্রিক ভাবে বিচার করতে গেলে শরৎ পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক তারাশঙ্করকেই বলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু সাহিত্য জগতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাম নিয়েই আবির্ভূত হন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩৫ সন থেকে গল্পরচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তারাশঙ্কর যেমন পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষের মানুষদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তেমনি পূর্ববঙ্গের অঞ্চল বিশেষের জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন। এই সময় সাহিত্যে ফ্রয়েডপন্থী মনোবিকলন ও মনোবিকারতত্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই সূত্রে বিশাল নদী প্রান্তরে সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষের কামপিপাসার এক জীবন্ত ছবি তুলে ধরে মানিক আদিম পৃথিবীর অন্ধকারে ফিরে যেতে চেয়েছেন। পাঠকবৃন্দ সেই আদিম জীবন চিত্র ও মনোবিকারের পরিচয় পেয়ে চমকে উঠেছিলেন। এই সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সমস্ত উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন, সে গুলি হল— 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি' 'শহরতলী' , 'অহিংসা' প্রভৃতি।

তাঁর বিশেষ বিশেষ ছোটগল্পগুলি হল — 'অতসীমামী', 'প্রাগৈতিহাসিক' , 'মিহি ও মোটা কাহিনী' , 'সরীসৃপ' প্রভৃতি। গল্পগুলি পাঠকদের দারুণ ভাবে আকর্ষণ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে মানুষকে দেহজীবীরূপেই দেখেছেন। তাদের কামনা বাসনাকে সূক্ষ্ম ভাবরসে নিমজ্জিত করতে চাননি। তারাশঙ্কর যেমন মাটির মানুষকে একটি বড় সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সেরকম দার্শনিক মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সৃষ্টিকলার মধ্যে অন্তর্নিহিত কিছু বিশৃঙ্খলা ও এলোমেলো ভাব অনেক সময় কথা সাহিত্যের রসকে ক্ষুন্ন করেছে। সে যাই হোক শরৎ পরবর্তীকালে বিভূতি ভূষণ ও তারাশঙ্করের সমপর্যায়ে তুলে ধরা

যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক যেমন ছিলেন তেমনি গল্প ও উপন্যাসে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি উপন্যাসের যে গতানুগতিক ধারা তার মোড় ফেরাতে চেয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ করে একটি নতুন বিষয় উপন্যাসে তুলে ধরলেন, তা হল কয়লাকুঠির শ্রমিকদের দুঃখপূর্ণ জীবন চিত্র। তাঁর 'নারীমেধ'ও 'বধূবরণ' রচনার মধ্যে মানুষের নির্মম জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এই বিষয়গুলি একেবারে অভিনব।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল– 'ঝোড়ো হাওয়া', 'লক্ষ্মী', 'হাসি', 'রাঙ্গাশাড়ি' 'বাংলার মেয়ে' , 'কয়লাকুঠির দেশ', 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', 'বানভাষী', 'ষোলআনা' 'খরস্রোতা , 'অনিবার্য' 'জোয়ার-ভাঁটা', 'গঙ্গা-যমুনা', 'শহর-থেকে দূরে', 'মানে না মানা' 'কাঁকনতলার মেয়ে' ,'ক্রৌঞ্চমিথুন'ইত্যাদি।

শৈলজানন্দের উল্লেখযোগ্য আরও গল্পগ্রন্থগুলি হল– 'মারণযন্ত্র', 'দিনমজুর', 'নারীজন্ম' 'ঠিকঠিকানা', 'ভালোবাসার নেশা', 'প্রেমের গল্প', 'পৌষ-পার্বণ', 'জীবন নদীর তীরে' ইত্যাদি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কথাসাহিত্যে নিয়ে এলেন নতুন স্বাদ। শ্রমিক বা কুলিমজুররা যে গল্পের উপাদান হতে পারে সে কথা শৈলজানন্দের আগে আর কেউ তুলে ধরেননি। শৈলজানন্দ কথা সাহিত্যে নিয়ে এলেন রাণীগঞ্জের কয়লাখনির ভিতর থেকে কাঁচা হীরের টুকরো। খনির মজুর এবং কুলি কামিনের অশ্রু মেশানো হাসি পাঠক বৃন্দকে মুগ্ধ করে দেয়। কয়লা খনির মজুরদের ব্যক্তিগত কথা এবং তাদের আভ্যন্তরিন অভিজ্ঞতার চিত্র সাহিত্যে তুলে ধরলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কলমে চলে এল তপশিলী ও উপজাতি সমাজের দুঃখ-দুর্দশার ছবি।

তাঁর 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসে কুলি-মজুর-সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, উৎসব অনুষ্ঠান তুলে ধরে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আর 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' উপন্যাস গ্রামীন মানুষের সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন। আবার 'ঝোড়ো হাওয়া' উপন্যাসে গ্রামীন জীবনের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার রূপায়িত হয়েছে।

শৈলজানন্দের ছোটগল্পে আছে কুলি - মজুরদের অশিক্ষা, সরলতা ও জৈব-প্রবৃত্তির কথা। 'জননী' গল্পে দুজনের মেয়ে জামায়ের চরিত্রহীনতার কারণে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। সেজন্য দুখন আর পরীর বিয়ে দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে এবং পরীকে দিয়েও প্রতিজ্ঞা করিয়েছে। কিন্তু পরীকে সাঁওতাল যুবক টুরার মনে যৌন ক্ষুধা হয়ে ওঠে। সে পরীকে কয়লাখনির খাদে পেয়ে যৌন সম্ভোগ করে। এরপর পরী অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়লে সে তার দিদির

মত আত্মহত্যার কথা ভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নব জাতকের কথা ভেবে আর আত্মহত্যা করে না। 'মরণ বরণ' গল্পে রুকি বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাটুলকে বিয়ে করে সুখী -হয়নি। তাই রুকি এক সাহেবের সঙ্গে দেহ মিলনে রাজি হয়। 'জয়া' গল্পের মধ্যদিয়ে জয়া চরিত্র নতুন কাল নির্দেশ করেছে।

জগদীশ গুপ্ত বাংলা কথাসাহিত্যে ফ্রয়েড প্রভাবিত লেখক বলে পরিচিত। জগদীশ গুপ্তের মানুষেরা অবচেতনাশ্রয়ী জটিল বক্রতার মধ্যদিয়ে ফ্রয়েডীয় পন্থীর দিকে যাত্রা করেছেন।

লেখকের ১৫টির মধ্যে ৮টি উপন্যাসই মানবচিত্তের কথা । তাঁর রচনাগুলি হল — 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'মহিষী', 'দুলালের দোলা', 'লঘুগুরু', 'তাতল সৈকতে', 'রতি ও বিরতী' প্রভৃতি। আবার বাকি রচনায় সমাজের বহির্মুখিতার পরিচয় আছে। যেমন 'রোমন্থন' 'গতিহারা জাহ্নবী', 'চৌধুরানী'। এখানে লেখকের বহিরঙ্গ সমাজ জীবন সম্পর্কে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র একদিকে ঔপন্যাসিক, আবার অন্যদিকে কবিও বটে। তিনি গল্প উপন্যাস লিখে একসময় তরুণ সমাজের অগ্রদূত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। উন্যাসগুলিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বক্তব্য অসাধারণ আর মৌলিকতায় পরিপূর্ণ। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পাঁক', 'মিছিল', অতি আধুনিক মানের উপন্যাস হিসাবে পরিগণিত হয়। এই 'পাঁক' উপন্যাসে শহরের বস্তিজীবনের কথা আছে। 'মিছিল' উপন্যাসে নারী নির্যাতনের একটি নিষ্ঠুর ও বাস্তব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেকগুলি গল্পের বই লিখেছেন। সেগুলি হল — 'পঞ্চশর', 'বেনামি বন্দর', ' পুতুল ও প্রতিমা', 'মৃত্তিকা' এছাড়া বড় গল্প বা উপন্যাস হল — 'বাঁকা লেখা', 'উপনায়ন', 'আগামীকাল', 'প্রতিশোধ' ইত্যাদি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'মিছিল' ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ১৩৩৬ এর আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের শচীন চরিত্রটির সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিহাস'র কুমুদ চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাঁর 'আগামীকাল' উপন্যাসটি 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ , আষাঢ়, শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে পেমেন্দ্র মিত্র নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠার কথা, এবং সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন।

'কল্লোলে'র ভাবাদর্শকে সামনে রেখে প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনা করেন 'শুধু কেরাণী'। এটি তাঁর প্রথম গল্প। একটি ছেলে আর একটি মেয়ের গল্প 'শুধু কেরাণী'। ছেলেটি অফিসের কেরাণী। মেয়েটি তার বউ। তারা দরিদ্র হলেও খুব সুখী ছিলেন। একটি মেয়ের জন্ম হল

তাদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দারিদ্রতার কারণে তাদের মেয়েটিকে বাঁচাতে পারলেন না। মেয়েটি কিন্তু মরতে চায়নি। সে বাঁচতে চেয়েছিল। সে রাতদিন কেঁদে ভগবানের কাছে জীবন ভিক্ষা চেয়েছে। কিন্তু জীবন নাট্যের ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসে। তাঁর আর একটি বিখ্যাত গল্প 'কল্লোলে' প্রকাশ পায়। তার নাম 'মোট বারো'। এই গল্পের মধ্য দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষ ও পশুর সহাবস্থানের কথা তুলে ধরেছেন। গঙ্গার ধারের একটি ঘরে থাকে ঘোড়া, আর অন্য ঘরে থাকে তার সহিস খমান্ত। দুজনেই প্রায় ১৫ বছর একই সঙ্গে ছিল। দুজনেই এখন বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছে। খমতির কাছে এসে জুটল মাঝ বয়সী মেয়ে মানুষ দুলারী। ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে খমতি আর দুলারীর মধ্যে বিবাদ। পশুর সঙ্গে থেকে থেকে তারাও কি শেষপর্যন্ত পশুত্বে নেমে গেলেন ?

আবার 'পুন্নাম' গল্পের মধ্য দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র সন্তান বাৎসল্যের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পে দেখা যায় ললিত জাহাজ থেকে মাল চুরি করেন পুত্রকে সুস্থ্য করার জন্য। 'শৃঙ্খল' গল্পে ভূপতি ও বিনতির ব্যর্থ-দাম্পত্য জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রেম নয়, তার চেয়ে তীব্র, তার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তারা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। সে শৃঙ্খল ছিঁড়ে গেলে বাঁচবার সম্বল আর কি থাকলো। স্টোভ,সাপ প্রভৃতি বিষয়কে প্রতীক করে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'স্টোভ', 'সাপ' গল্প রচনা করেছেন। নায়ক-নায়িকার বিকৃত ক্ষুধা নিয়ে রচিত 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'। এই গল্পে দেখানো হয়েছে যৌবন চলে গেলে বরবধূর আর কিছু থাকে না। আসল কথা যৌবনই তার মূলধন। বেগুন বিগতা যৌবনা। তার ঘরে এখন খদ্দের আসেনা। সে এখন খদ্দের খুঁজে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত যে খদ্দের তাকে পছন্দ করে না, তার কাছেও তাকে যেতে হয়, তাকেই রাতের সঙ্গী করতে হয়। ভিন্ন রীতিতে লেখা 'তেলেনা পোতা আবিষ্কার' বিখ্যাত ছোটগল্প। এ গল্পের নায়ক একজন পাঠক। মহানগরী থেকে তিন যুবক মিলে যায় তেলেনাপোতায় বেড়াতে। সেখানে যামিনীর বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। তিন যুবকের একজন বৃদ্ধা মাকে 'নিরঞ্জন' বলে পরিচয় দিয়ে যামিনীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি সহজেই হারিয়ে যায়।

বনফুল ছোটগল্প, উপন্যাস, ও নাটকে অবাধে বিচরণ করেছেন । তাঁর উপন্যাস গুলি হল — 'তৃণখন্ড', 'মৃগয়া', 'দ্বৈরথ', 'জঙ্গম' ইত্যাদি বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করে তিনি পাঠক মহলে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচিত গল্প গুলি হল — 'বৈতরণীর তীরে', 'বাহুল্য', 'বিন্দুবিসর্গ'। বনফুল কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে নানা অভিজ্ঞতা , ভূয়োদর্শন, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ে বিস্ময়কর তথ্য পরিবেশন করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার জন্য রোমান্সকেই হাতিয়ার করলেন। যার ফলে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে রোমান্সের ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল — 'সাড়া', 'যেদিন ফুটল কমল' , 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'মৌলিনাথ', 'তিথিডোর' প্রভৃতি।

এই সমস্ত উপন্যাসে বাঙালী জীবনের বাস্তব সম্পর্কহীন রোমান্টিক কাহিনী রচনা করেছেন। আবার অনেকের মতে বুদ্ধদেব বসু রিয়ালিজমের ধারাকে আমদানী করেছেন। তবে তাঁর উপন্যাস ও গল্পের কাহিনী, চরিত্র ও পরিবেশ রিয়ালিজমের ঘোর বিরোধী।

অন্যদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের নজরুলের মতো স্বতন্ত্র সত্তার কবিরা হচ্ছেন — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মোহিতলাল মজুমদার। নজরুলের সমকালে আরও যে সমস্ত কবিরা রয়েছেন তাঁরা হলেন— করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়। এ সমস্ত কবিরা রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত যথার্থ রবি - অনুরাগী। বুদ্ধদেব বসু 'কল্লোলে'র একজন বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক। তাঁর 'রজনী হল উতলা' গল্পটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অভিনয়', অভিনয় নয়' গল্পটি কল্লোলে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'প্রথম ও শেষ'। দুই বান্ধবীর পত্র বিনিময়ের ফলে গল্পে এসেছে অপ্রত্যাশিতের অভিঘাত জনিত চমক। এ গল্পে প্রেমের অভিনয় দাম্পত্য জীবনকে ও মিথ্যা করে তুলেছে। বিনোদিনী পুতুলের অভিনয়কেই বিশ্বাস করেছে। 'পুরাণের পুনর্জন্ম' গল্পে বুদ্ধদেব বসু পুরাণের চরিত্রের নবজন্ম ঘটিয়েছেন।

১৯৩১ সালে 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয় 'রেখাচিত্র'। এছাড়া 'ছায়াচিত্র' 'জ্বর', 'আত্মহত্যা', 'গৃহ', 'মেজাজ', 'রাত বারোটার পরে' প্রভৃতি গল্প যেন সমকালের ছায়াচিত্র।

১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয় 'এরা আর ওরা এবং আরও অনেক' গল্পগ্রন্থ। গল্পটি অশ্লীলতার দায়ে সে সময় বাজেয়াপ্ত হয়। এই গল্পগ্রন্থের সবগুলি গল্পই রোমান্টিক। 'বজ্রধর ও শবরী রায়', 'অতনু মিত্র' 'সুনীল আর লুসি ললিতা', 'নিরঞ্জন রায় ও উমা' প্রভৃতি গল্পে বিচিত্র প্রেমের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 'তুমি কেমন আছো', 'প্রেম পত্র' গল্পে আছে প্রেম ও জীবনের নষ্টালজিয়ার আচ্ছন্নতা।

'তুমি কেমন আছো' গল্পে কাব্যিক পটভূমিকায় প্রেম ভাবনা ও রোমান্টিকতা গুরুত্ব পেয়েছে।

'এমিলিয়ার প্রেম' বুদ্ধদেব বসুর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। ভালোবাসা আর কামনা গল্পের কাহিনীকে নিয়ে গেছে ভিন্ন 'এমিলিয়ার প্রেম' বুদ্ধদেব বসুর একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। ভালোবাসা আর কামনা গল্পের কাহিনীকে নিয়ে গেছে ভিন্ন এক জগতে। ভাস্কর, এমিলিয়া, তার প্রদোষকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনী গতি পেয়েছে। প্রদোষকে দেখে ভাস্কর্যের ঈর্ষা হলেও শেষ পর্যন্ত সুন্দরী এমিলিয়াকে শিল্পী ভাস্কর নিজের কাছেই ফিরে পেয়েছে- 'আর ভয় নেই। এখন সে চিরকাল আমার।'

১৯৩৭ সালে রচিত 'ফেরিওয়ালা' গল্পে আছে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের চিত্র। 'ওস্তাদজি', 'লালগোলাপ' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্র প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েও রোমান্টিক আবেগের সঙ্গে জ্ঞান, তত্ত্বকথা, বুদ্ধির দীপ্তি, ক্লাসিক সংযমের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। গীতাধর্ম ও কল্পনার ঐশ্বর্যও তাঁর মধ্যে মিশেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উৎকৃষ্ট কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য — 'বেণু ও বাণী', 'তীর্থসলিল' (অনুবাদ কবিতা) ঐ 'তীর্থরেণু' (অনুবাদ কবিতা), 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র ও আবীর', 'হসন্তিকা' । সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যরচনার সঙ্গে একখানি উপন্যাস 'জন্মদুঃখী', এক খানি নাটক 'রঙ্গমল্লী' রচনা করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হলেও কাব্যক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছেন। ছন্দ নিয়েও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যেমন ইংরেজী ছন্দ, সংস্কৃত ছন্দের অনেক চর্চা করেছেন। এ জন্য রবীন্দ্রনাথ তাকে 'ছন্দের রাজা' বলতেন। এছাড়া শব্দযোজনার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব, আবার বাক্‌ভঙ্গিরও অনেক পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কাব্যের ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান রেখেছেন প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় ইতিহাসের চর্চা করে। প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কাব্যরঙ্গভূমির প্রধান পাত্র-পাত্রী। সতেন্দ্রনাথ দত্ত যুক্তির দ্বারা কল্পনাকে সংযত করেছেন। বাস্তব প্রত্যয়ের দ্বারা আবেগকে সীমার মধ্যে টেনে এনেছেন। তাঁর প্রেম ও সীমার মধ্যে অলকাপুরী নির্মাণ করেছেন। সতেন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা 'চম্পা'। চম্পার সৌন্দর্য ও ট্র্যাজিডির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —

আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে,
বিষন্ন যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত,
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে, আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হল সাহসিকা অপ্সরার মতো।
বনানী শোষণ ক্লিষ্ট মর্মরি উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর।

সত্যেন্দ্রনাথ 'আফিস এর ফুল' কবিতায় লিখেছেন—

আমি বিপদের রক্ত নিশান,
আমি বিষ বুদবুদ
আমি মাতালের রক্তচক্ষু
ধ্বংসের আমি দূত।

সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতার অনুসরণে কাজী নজরুল ইসলামও লিখেছেন। নজরুল জাতিভেদ, ধর্মভেদ মানতেন না। সতেন্দ্রনাথ অবশ্য ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনিই প্রথম মহাসাম্যের গান গেয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম লিখেছেন শ্রমিক ধর্মঘটের কবিতা। এভাবেই তিনি শ্রমিক শক্তির বন্দনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্পর্কে ড. সুশীলকুমার গুপ্ত বলেছেন– ''যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের উপরও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব

ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের চারণ-কবির ভূমিকাটি একমাত্র নজরুল ছাড়া আর কেউ গ্রহণ করতে পারেন নি। ২

মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রযুগে আর্বিভূত হয়েও কিছু মৌলিক কাব্য-কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আবার রবীন্দ্রভাবনা থেকেও বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে একাধারে কবি ও সমালোচক। মোহিতলাল কাব্যের ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন ভোগবাদের সুর।

মোহিতলাল মজুমদার প্রকৃতিকে বিশ্বাস না করেও সুন্দরের কাছে ধরা দিয়েছেন। ' পান্থ' কবিতায় তাই তিনি বলেছেন- যে তিনি সুন্দরী প্রকৃতিকে জানে কিন্তু মিথ্যা সনাতনীকে চান না। মোহিতলাল ঈশ্বর বা ধর্মকে বিশ্বাস করতেন না। সে কথা 'মোহমুদগর' কবিতায় বলেছেন —

দেহে তোর প্রাণ আছে ?
তবে কেন ওরে ভীরু নিত্য উপবাসী
চিরমৃত্যু মোক্ষ অভিলাষী

মোহিতলাল যে সমস্ত কাব্য রচনা করেছেন, সেগুলি হল — 'স্বপনপসারী' , 'বিস্মরণী' , 'স্মরগরল', 'হেমন্ত গোধূলি' , 'ছন্দ চতুর্দশী' প্রভৃতি। রবীন্দ্র পরবর্তী বন্যায় সবাই ভেসে গেলেও মোহিতলাল মজুমদার এখনও সমান ভাবে জনপ্রিয়। তাঁর দেহবাদের এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জীবনের সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। যদিও এই ভাবনা অনেকের কাছে প্রীতিকর মনে হয়নি। কিন্তু সংস্কারের চশমা খুলে দিলে বোঝা যাবে ক্লাসিক ও রোমান্টিক ভাবনা এক সঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় নি। কখনো তিনি দেহকে অবলম্বন করেও দেহাতীতের জন্য আক্ষেপ করেছেন। যার ফল স্বরূপ রাধা ও মেডোনাকে একাকার করে দিয়েছেন। জগতের দুঃখ বেদনাকে অমৃতে পরিণত করেছেন। রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়েও তিনি নতুন কাব্য ভঙ্গি ও কাব্য প্রত্যয়ের আমদানী করেছেন।

মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সাহিত্য জীবনের শুরুতে মোহিতলাল মজুমদার ও সজনীকান্ত দাস মহাশয় নজরুল কাব্যের তীব্র সমালোচনা করতেন। নজরুল যখন 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লেখেন তার সমালোচনা স্বরূপ 'শনিবারের চিঠিতে' ১৯২৪ সালের ২৬ শে জুলাই মাসে 'ব্যাঙ' নামক কবিতাখানি রচিত হয়। যেমন —

আমি ব্যাঙ
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ
আমি ব্যাঙ

দুটা মাত্র ঠ্যাং। ...
কবিতাটি তাল ফেরতায় ব্যাঙ সাপ হয়ে গেছে—
আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর- ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।
আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিত ফণা,
আমি ছোবল মারিলে নরের আয়ুর মিনিট যে যায় গনা ...
আমি নাগশিশু, আমি ফণী মনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি 'বে অপ বিস্কে' সাইক্লোন' আমি, মরু সাহারার আঁধি।

এই কবিতাটি দেখার পর নজরুল মোহিতলালকেই সন্দেহ করেন। উত্তরে মোহিতলালকে নজরুল জবাব দেন 'সর্বনাশের ঘন্টা' নামক কবিতায়। এরপর মোহিতলাল নজরুলের জবাবে অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে 'দ্রোণ-গুরু' কবিতা রচনা করে নজরুলকে অত্যন্ত অসংযত ভাষায় আক্রমণ করেন। কবিতাটি 'শনিবারের চিঠি'-র দ্বাদশ সংখ্যার ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়। এই কবিতার কয়েকটি লাইন এখানে তুলে ধরা হল —

আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর -
অধঃপাতের দেরি নাই আর, ওরে হীন জাতি চোর!
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে ! ওরে মিথ্যার রাজা !
আত্মপূজার ভন্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার, -মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতল!
দুদিনের তোমার, মুখোশ মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে
অভিশাপরূপী নিয়তী করিবে নিদারুন পরিহাস
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্রগ্রাস!
মিথ্যায় ভুলি' যে মহামন্ত্র গুরু দিয়েছিল কানে,
বড় প্রয়োজনে পড়িবে না মনে, সে বিফল সন্ধানে
নিজেরি অস্ত্র নিজেরি হানিবে শেষ হবে অভিনয়,
এতদিন যাহা নেহারি, সকলে নেমেছিল বিস্ময়!

নজরুল যুগে মোহিতলাল মজুমদারের সাহিত্য ও সমসাময়িক ঘটনা আলোচনা করলে দেখা যায় নজরুলের সঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের সম্পর্ক প্রথমদিকে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ক্রমশ সেই বন্ধুত্বের মধ্যে চিড় ধরতে শুরু করে । ক্রমশ দূরে যেতে যেতে দুজনে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের (আষাঢ় মাসে) 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত 'বাদল প্রাতের সরাব' নামে একটি কবিতা বের হয়। সেই কবিতাটি মোহিতলাল পড়েন।

এরপর মোহিতলাল নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রাবণ মাসে নজরুলের আরও একটি কবিতা বের হয়। কবিতার নাম 'খেয়াপারের তরী'। উক্ত কবিতা পাঠ করে মোহিতলাল প্রীত হয়ে 'মোসলেম ভারত'-এর সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন।

পত্রটি 'মোসলেম ভারত'-এ প্রকাশিত হলে কাজী নজরুল ইসলাম পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে মোহিতলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই পরিচয়ের পরে নজরুল ও মোহিতলালের মধ্যে আবার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারা দুজনে বিভিন্ন জায়গায় একসঙ্গে আড্ডা মারেন। কখনো দুজনে একই সঙ্গে গমনাগমনও করতে থাকেন। দেখা যায় এই ভাবে নজরুল ও মোহিতলালের মধ্যেকার সম্পর্ক অটুট থেকে যায়।

নজরুলের জীবনে সাহিত্যিক বন্ধুর তুলনায় স্বাধীনতা , সংগ্রামীদের প্রভাবও কম ছিলনা। এই রকম একজন সাহিত্য প্রেমী ও সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে আশৈশব তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর নাম শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ছোটোবেলা থেকেই নজরুল ও শৈলজানন্দ দুজনেই সাহিত্যের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শৈলজানন্দ কবিতা লিখতেন আর নজরুল লিখতেন গল্প। কিন্তু পরে নজরুল হলেন কবি আর শৈলজানন্দ হলেন কথাসাহিত্যিক ।

আর একজন বন্ধু বিখ্যাত শ্রমিক আন্দোলনকারী মজুফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর প্রভাব কাজী নজরুলের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। নজরুল করাচীর সেনাবাসের ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে ছিলেন। পরে তিনি মাষ্টার হাবিলদার পদ গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম বিভিন্ন কবিতা, গল্প, মজুফ্ফর আহমদের নামে পাঠিয়ে দিতেন। তা মজুফ্ফর আহ্মদ 'বঙ্গীয় মসুলমান সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশ করে দিতেন। ১৯২০ সালে বাঙালী পল্টন ভেঙে গেলে নজরুল কোলকাতার ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীটে মুজফ্ফর আহ্মদের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার' সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। এরপর এই পত্রিকায় লেখালেখি ও আলোচনার মাধ্যমে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে নজরুলের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক সারা জীবন বজায় ছিল।

মুজফ্ফর আহ্মদ ও নজরুল সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক ড. সুশীল কুমার গুপ্ত বলেছেন- ''মুজফ্ফর আহ্মদ শুধু একজন জনগন-বন্ধু ও প্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতাই নন, তাঁর মত সাহিত্য প্রাণ ও দরদী বন্ধু সত্যই দুর্লভ। একথা মনে করার যথেষ্ট্য কারণ আছে যে, মুজফ্ফর আহ্মদের বৈপ্লবিক আদর্শে অনেকাংশে প্রেরনা গ্রহণ করে নজরুল অগ্নিবীণা হাতে বাংলা কাব্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছিলেন জাতীয় চারণের বেশে।''৩

আর একটি পত্রিকা দপ্তর নজরুলের জীবনকে সাহিত্য সাধক হিসাবে গড়ে তোলে। সেই পত্রিকার নাম 'মোসলেম ভারত'। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল হক। তাঁর ছেলে আফজালুল হক মূলত পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করতেন। পত্রিকাটির দপ্তর ছিল 'বঙ্গীয়

মসুলমান সাহিত্য সমিতির' পাশের ঘরে। পাশাপাশি দুটি পত্রিকা থাকায় স্বাভাবিক কারণে সাহিত্য প্রেমী মানুষদের আড্ডা দেওয়ার ঘর হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে নজরুল প্রতিনিয়ত আসতেন। গল্প-হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে নজরুল সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন। এখানে শুধুমাত্র মুসলমান সাহিত্যিকরাই আসতেন এমন নয় অনেক হিন্দু সাহিত্যিকরাও আসতেন। যেমন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, প্রমুখ সাহিত্যিকরা। এই সমস্ত নামী-দামী সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে নজরুল জীবনের প্রতিভা গড়ে ওঠে। এরপর দুজনে ৮এ টার্নার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাস করতে শুরু করেন। পরে ৬, টার্নার ষ্ট্রীট থেকে মুজফ্ফর আহ্মদ ও তাঁর যুগ্ম সম্পাদনায় 'নবযুগ' নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এরপরেও কিছুকাল নজরুল মুজাফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাসের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী বাংলা সাহিত্য ও শিল্পসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে জাতীয় জাগরণের জোয়ার এসেছিল তা মূলত এই ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করে। আবার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের মানুষের মনে যে জাতীয়তাবোধের উত্তাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাও মূলত এই ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করেই। ঠাকুরবাড়ির কাছে আমরা ঋণী সেই সমস্ত প্রতিভাধর মানুষদের জন্য। যাঁরা ঠাকুরবাড়িতে জন্মে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড় বড় অবদান রেখে গেছেন। সেই ঠাকুরবাড়িতেও নজরুলের যাতায়াত ছিল। আর তিনি রবীন্দ্রনাথের বড় ভক্ত ছিলেন ।

সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক আড্ডার বিশেষ প্রভাব ছিল। সে সময় আড্ডার মাধ্যমে অনেক সৃজনশীল সাহিত্য কর্মের উদ্ভব হয়েছিল। কোলকাতায় দুই জায়গায় সাহিত্য প্রেমী মানুষেরা আড্ডা দিতেন। একটি ছিল সুকিয়া ষ্ট্রীটে কান্তিক প্রেসের তেতালায় 'ভারতীর আড্ডা'। আর দ্বিতীয় আড্ডাটি ছিল ৩৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে 'গজেন দার আড্ডা'। সকালবেলায় ভারতীর আড্ডায় যারা বসতেন, তারা হলেন-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, গিরিজাকুমার বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মোহিতলাল মজুমদার, তাঁরাই আবার সন্ধ্যার সময় গজেনদার আড্ডা বসতেন। নজরুলও এই আড্ডায় মাঝে মাঝে আসতেন। তিনি সেখানে প্রায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। নজরুলের স্বরচিত গান প্রায় ছিল না। একটি বিখ্যাত গান — ''পথিক ওগো চলতে পথিক তোমায় আমায় পথের দেখা।" এই গানটি চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২৭ সালের (১৯২১) মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই 'নারায়ণ' পত্রিকার সঙ্গেও নজরুলের যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাকে নিয়েই একটি কাব্য রচনা করেন। সেই কাব্যের নাম 'চিত্তনামা'। এছাড়া কিছু কিছু কবিতাও এই 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

এছাড়া 'বিজলী' পত্রিকার সঙ্গেও নজরুলের যোগ ছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। নজরুলের সঙ্গে নলিনীকান্তের আন্তরিক হৃদ্যতা ছিল। এই

'বিজলী' আফিসে মাঝে মধ্যেই নজরুল গান ও কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে ধন্য করে দিতেন।

এছাড়া 'বিজলী' পত্রিকার সঙ্গেও নজরুলের যোগ ছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। নজরুলের সঙ্গে নলিনীকান্তের আন্তরিক হৃদ্যতা ছিল। এই 'বিজলী' আফিসে মাঝে মধ্যেই নজরুল গান ও কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে ধন্য করে দিতেন।

'আর্য পাবলিশিং হাউসের' সঙ্গেও নজরুলের আনাগোনা ছিল। সেখানেও তিনি প্রায় প্রায় আসতেন আড্ডা মারার জন্য। ব্রজবাবু ছিলেন এখানকার প্রকাশক। তিনি নজরুলের 'সর্বহারা', 'ফণীমনসা' ও 'দুর্দ্দিনের যাত্রী' গ্রন্থগুলি প্রকাশ করে দেন। এই বইয়ের দোকানে নজরুল আড্ডা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি ও হারমোনিয়াম সহযোগে গান করতেন।

তিনটি পত্রিকা 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' বাংলা সাহিত্যের ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে আধুনিকতাকে আহ্বান জানিয়েছিল। এই তিনটি পত্রিকাতেই নজরুল লিখতেন। 'কল্লোলে'র সম্পাদক ও সহ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ। 'কল্লোল' প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩৩০ সাল (১৯২৩)। 'কালিকলমের' প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে বৈশাখ, ১৩৩৩ (১৯২৬)। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের সম্পাদক ছিলেন মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র। দ্বিতীয় বর্ষের সম্পাদক ছিলেন মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় বর্ষ থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে গেছেন মুরলীধর বসু। 'প্রগতি'র সম্পাদক ছিলেন অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু। পত্রিকাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩৩৮ সালের আষাঢ় মাসে (১৯২৭)। 'কল্লোল' পত্রিকাই সেই সময়ের নতুন ভাবধারাকে প্রতিনিধিত্ব করত। 'কালিকলম' আর ' প্রগতি' পত্রিকা দুটি 'কল্লোল' পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই উত্তর বিশের যুগকে 'কল্লোল যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। 'কল্লোল'কে নিয়ে যে প্রাণোচ্ছ্বাস তা শুধু ভাবের দেউলে নয় ভাষারও নাটমন্দিরে। অর্থাৎ 'কল্লোলের' বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও ভাবকে দ্যুতি দেবার জন্যে ছিল শব্দসৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনা শৈলীর বিচিত্রতা। এমনকি বানানের সংস্করণ।

কেননা তার সাধনাই ছিল নবীনতর, অনন্যতার সাধনা। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে এর প্রচন্ড অস্বীকৃতি। যা আছে তার চেয়েও আরো কিছু, বা যা হয়েছে তা এখনো পুরোপুরি হয়নি তারই নিশ্চিত আবিষ্কার।

'কল্লোলের' ভাবধারার সঙ্গে নজরুলের চিন্তা-চেতনার অনেক মিল আছে। সেই কারণেই 'কল্লোলে'র সঙ্গে নজরুলের অতিসহজেই হৃদ্যতা গড়ে ওঠে, তবে এ প্রসঙ্গে

উল্লেখ্য যে 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ ছিল মূলত রবীন্দ্র রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে। 'কল্লোলে'র বাস্তববাদ অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মবাদের বিরোধিতা হিসাবেই দেখা দিয়েছে। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের মোহ-বিচ্যুতি, যৌনধারণা অনুপান এ সবও ছিল 'কল্লোলে'র চরিত্র বৈশিষ্ট্যের একটি । নজরুল 'কল্লোলে' যোগদান করে রবীন্দ্রবিরোধীতায় নিজেকে সীমিত না রেখে এক বৃহত্তর সংগ্রাম চেতনার ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন।

এছাড়া স্বাধীনতাযজ্ঞের ঋত্বিক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সর্বহারাদের নেতা মুজফ্ফর আহ্মদের সহচর্যে মুক্তিযুদ্ধের যে মূর্তি উদ্ঘাটিত হয়েছিল, তা নজরুল- কাব্যে একটি বিশেষ বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের রূপে আত্মপ্রকাশ করে । নজরুল তাঁর বিদ্রোহ ও বিক্ষোভকে 'কল্লোলে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কাব্যসরস্বতীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন।

কাব্য-কবিতা-গানে নজরুল ছিলেন রোমান্টিক, আবেগপ্রবন। তিনি চির তরুণ, সদা-চঞ্চল, গতিময় আর বিদ্রোহী। পদ্যবন্ধের মত গদ্যবন্ধেও তাঁর প্রকাশ সবেগ ও আবেগে অস্থির।

তথ্যসূত্র:

১. সেনগুপ্ত, ড. বাঁধন : কবি নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১০, পৃ: ১৮।

২. গুপ্ত, ড. সুশীলকুমার : নজরুল চরিত মানস, দেজ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ,২০১২, পৃ:২৭ ।

৩. গুপ্ত, ড. সুশীলকুমার : তদেব, পৃ: ২৯ ।

৪. এই অধ্যায়ে পদ, বাক্য, গৃহীত হয়েছে যে দুটি গ্রন্থ থেকে, উক্ত গ্রন্থ দুটি হল কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র (১ম,২য়, ৫ম খন্ড) , পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৫।